রবিবার, ১৫ পৌষ, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৫

দুর্ব্যবহার করলেই শাস্তি হবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত সাধুবাদযোগ্য

সম্প্রতি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রোগীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেই শাস্তি হবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের। নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত সাধুবাদযোগ্য। শুধু চিকিৎসায় গাফিলতি নয়, রোগী বা রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে চিকিৎসকদের একাংশের খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল আরও জানিয়েছে যে, ঘটনার সত্যতা ও গুরুত্ব বুঝে বাতিল করা হতে পারে অভিযুক্ত চিকিৎসকের লাইসেন্সও। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যে নানান কারণে চিকিৎসকদের সঙ্গে রোগীর বা রোগীর আত্মীয়দের সম্পর্কে দূরত্ব বৃদ্ধি হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়িনবৃত্তি। সে বেসরকারি নার্সিংহোম হোক বা চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বার, কিছু চিকিৎসক তাঁদের মহৎ দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গিয়ে তাকে ব্যবসা হিসাবে ধরে নিয়েছেন। এমনকি পরিমাণ মতো অর্থ না পেলে মরণাপন্ন রোগীকে চিকিৎসা দিতেও অস্বীকার করতে দেখা গিয়েছে। এনিয়ে একাধিক অভিযোগ বারংবার আসায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তিনি বারবার বলেছেন, চিকিৎসাকে ব্যবসা নয়, সেবার মন নিয়ে দেখতে হবে। সম্প্রতি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ নির্মল মাজি এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেন, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত রোগীর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি তো দূরের কথা সামান্য ভালো ব্যবহার করেননি কয়েকজন চিকিৎসক এমন অভিযোগ বহু এসেছে। তাই এই সিদ্ধান্ত রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে অবশ্য চিকিৎসকদের কেউ কেউ যে গ্রহণ করতে পারবেন না এটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত যে নিঃসন্দেহে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরফলে উপকৃত হবেন বা সুবিচার পাবেন বহু রোগীর আত্মীয়। কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলকে যে, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণে তাঁরা যেন যথেষ্ট নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। না হলে সিদ্ধান্তের সঠিক প্রয়োগ হবে না। আর চিকিৎসা ব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল রয়ে যাবে সেই তিমিরেই।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মহিমা– তবে ওখানে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে) সবাই সমান। ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাইতে বলিতেছেন।

নরেন্দ্রের গান–

(১) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।

(২) অহঙ্কারে মত্তসদা, অপার বাসনা।
(৩) চমৎকার৪র অপার, জগৎ রচনা তোমার!
শোভার আগার বিশ্ব সংসার!
(৪) মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ।
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত।
মর্ত্তের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব, হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শোনাব হীতি এসেছি তাহারি লাগি।
গায় যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাইতে চাহে এই ভকতের চিত।
(৫) এহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও!
করুণা-বিখারী আমি করুণা কটাক্ষে চাও।।
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।।
কলুষ-কলঙ্কে তাহে আবরিত এ হৃদয়;
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে শোধন করিয়ে লও।।

দিনপঞ্জিকা

১৫ পৌষ, ভাঃ ১০ পৌষ, **৩১ ডিসেম্বর**, ১৫ পুষ, সংবৎ ১৩ পৌষ সুদি,১২ রবি সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৫৮। **রবিবার**, ত্রয়োদশী দিবা ঘ ১।৩১ মিঃ। রোহিণীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৪।৪৬ মিঃ। শুভযোগ দিবা ঘ ১।১৩ মিঃ। তৈতিলিকরণ, দিবা ঘ ১।৩১ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ১২।২৩ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**–বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, সন্ধ্যা ঘ ৪।৪৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ঘ ৩।৫৭ গতে মিথুনরাশিশূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। **মৃতে**–একপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ১০।২১ গতে ১।০ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১।২১ গতে ৩।২ মধ্যে। **যাত্রা**– শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ঘ ৯।৪৫ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ঘ ১।৩১ গতে মাত্র পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, সন্ধ্যা ঘ ৪।৪৬ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**–দিবা ঘ ১।৩১ মধ্যে **সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন** বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা **শান্তিস্বস্ত্যয়ন** হলপ্রবাহ বীজবপন মুহূর্ত্তচিন্তামণিমতে সীমান্তোন্নয়ন। **বিবিধ**– ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন ও চতুর্দ্দশীর সপিন্ডন। দিবা ঘ ১।৩১ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **পুর্ব্বাহ্ন** ঘ ৯।৫৫ রক্তমধ্যে **কুর্ম্মদ্বাদশী** ব্রতের পারণ। **অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৭।৫ গতে ৯।১৩ মধ্যে ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২৩ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**– দিবা ঘ ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৫পৌষ, ভাঃ ১০ পৌষ,৩১ ডিসেম্বর, ১৫ পুষ, ১২ রবিঃ সানি। উঃ ঘ ৬। ২৩, অঃ ৪।৫৮ রবিবার, ত্রয়োদশী দিঃ ঘঃ ১।৩১

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

বনফুলের ছোটগল্প ঃ কালের দৃষ্টিভঙ্গি

পার্থসারথি হাটী
পর্ব-২

এখানে বনফুলের সমাজ বীক্ষা অভ্রান্ত। অসামান্য কতকগুলি রেখাঙ্কনে আধুনিক পিতার চরম জীবন বাস্তবতা বোধকে তার উদ্বেগের মধ্যে ভেসে উঠতে দেখি। যতকিছু বৈপরীত্য তাঁর জীবনেই। ছোট্ট একটি চিঠি। চরম অভিঘাত। সমাজ ও জীবনের মুখোশটা খুলে যায় মাত্র চারটি শব্দের আবহে–'পুঁচি মারা গেছে কাল'। মাতৃত্বের সংগ্রাম থেকে সরে এসে 'নউ' নামক নারীটির সমাজ গঠনে পুরুষের ছাঁচে তৈরি হয়ে যায়। তবু বলতেই হয়, এত সহজ বাক্‌বিন্যাসে এমন শৈল্পিক কুশলতারপ্রকাশ এক অনন্য নজির। 'সনাতনপুরের অধীবাসীবৃন্দ' গল্পে শৈলেশ্বরবাবু এবং শ্যাম ধোপানীর সম্পর্কে কত কুৎসা রটিনোর মুখরোচক Form টা বহুল প্রচলিত, গ্রামীণ। আসলে সবটাই মিথ্যাচার। বনফুল এই জায়গায় মুন্সিয়ানার সঙ্গেই দেখালেন–শ্যামা ফিরে এল স্বামীর ঘরেই, সুসম্পর্কে তাদের চিড় ধরেনি। কিন্তু শৈলেশ্বরবাবু ফিরলেন না–কোনদিন ফেরেননি। কেন না চিত্র-চরিত্রের একটা ঝলক আমাদের সামনে উঠে এল। আর সেইসঙ্গে আর একটা মৃত্যুর খবর এসে পড়ার শৈশবে স্বাভাবিক হয়ে উঠল। আসলে জীবনের প্রতি যে মোহ থাকলে মৃত্যুর শিরশিরে জনজীবনকে আকাঙ্খিত ও মৃত্যুকে আশঙ্কিত করে তোলে বনফুলের গল্পের মধ্যে তার বড় অভাব। জীবনের গ্লানি তাঁকে যত আঘাত দিয়েছে, মৃত্যু তত নয়। তাই মৃত্যু তাঁর কোনও কোনও গল্পের পরিণতি নির্দেশক হলেও জীবনের মতো স্বাভাবিক ব্যক্ততাতেই তা আসে এবং নিরবতায় মিলিয়ে যায়।

বনফুলের কিছু গল্প আছে যেগুলো হাস্যরসপ্রবণ হয়েও হাসির গল্প থেকে সম্পূর্ণ অন্য পথে বাঁক নেয়। হাসির ঝিলিক কোথাও কেমন দু-একটি Flash দিয়ে মিলিয়ে যায়।'এই কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে তার নাম পুষ্পমঞ্জরি দিবি নাকি?' এখানে বুদ্ধিগ্রাহ্য হাসির আভাস দিয়েই পরক্ষণে বলেন.... 'আজকাল আবার শুধু টাকা হলেই হয় না। লোকে টাকাও চায়, রূপও চায় যে।' ফলে হাসিটা চলে গিয়ে ব্যাঙ্গের রেসটা থেকে যায়। সমাজ সমালোচনার এটাই বনফুলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাই তাঁর কিছু হাস্যরস প্রধান গল্প ব্যঙ্গের শৈল্পিক দাপটে তাদের পরিণতির স্তর পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিছক হাসি থেকে গল্প চলে যায় সমাজ এবং জীবনের অভ্রান্ত বীক্ষায়। গল্প হয়ে ওঠে কুঠার কিন্তু পরশুরামের থেকে স্বতন্ত্র। আবার এই পথেই প্রশ্ন ওঠে, হাস্যরস আর ব্যঙ্গের হাল্কা শিল্পরসের জারণে সিরিয়াসেন্স কতখানি রক্ষিত হয়। বাস্তবিকই বনফুলের গল্পে জীবন সম্পর্কিত সিরিয়াসনেস-এর অভাব আছে। জীবন যেন কতকগুলি প্রোজেকশন। 'বিধাতা' গল্পটি এক্ষেত্রে ধরা যেতে পারে। বিধাতার কাছে বাঘ থেকে বিভিন্ন সমস্যাভোগী মানুষ আসে এবং অভিযোগ জানায়। বিধাতাও শুনে যান এবং অভিযোগের তদন্ত ও সমাধানের আশ্বাসহেতু ভক্তদের কাছে প্রতিবারই 'আচ্ছা' শব্দটি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মুশকিল আসানের গল্প ছড়ান। অবশেষে অভিযোগের ছোটে বিধাতারপ্রস্থার কাছ থেকে খাঁটি সরষের তেল নিয়ে 'তাহা নাকে দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।' এবং তার 'আজও ঘুম ভাঙ্গে নাই।' এই গল্পের সমস্যাগুলো এক একটি ছবি। তা আসছে এবং মিলিয়েও যাচ্ছে। সমস্যা জানানোর মধ্যে গভীরা নৃত্যের আদল আছে। কিন্তু সমস্যাগুলি যথার্থ সমস্যা। নাকে তেল দিয়ে বিধাতার ঘুমানোর মধ্যেও সমস্যার স্তর যেমন হাল্কা হয়ে যায় তেমনি গল্পটি কেবল হাস্যরসাশ্রিত গল্প থেকে ভিন্ন মাত্রায় সরে গিয়ে সমাজ নেতৃত্বের মুখোশটাকেও খুলে দেয়। 'অদ্বিতীয়' গল্পে হাসির ঢেউটি ক্রমশ মিলিয়ে যায়, যা থাকে তা হলো আপাত ভালোবাসার মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি পুরুষের বঞ্চনার ব্যঙ্গ কথা। হাসির তরঙ্গ ওঠে যখন পুরুষটি বলে–

ক)'আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা ষষ্ঠী আমার সমান বাড়াইতেছিলেন। ....প্রভাবতী অর্থাৎ আমার গৃহিনী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন–মাঝে দুইবার যমজ হয়।'

খ) 'ফুলশয্যার রাত্রে বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার ছয়টি সন্তান ও আরও এক নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া।'

অর্থাৎ তার স্ত্রী মরেনি। তর্কের মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গ্যাছে। 'ক্যানভাসার' গল্পে কাত্যায়নীর বাক্যবাণে স্বামী ভৈরবের জর্জরিত হওয়ার মধ্যে হাস্যরসের রেশ থাকলেও দাঁতের মাজনের ফেরিওয়ালা হীরালালের গালে প্রচন্ড চপেটাঘাতের মধ্য দিয়ে মাজনের চরম বিজ্ঞাপন, ঝকঝকে সাদা দুপাটি বাঁধানো দাঁত খুলে যায় হীরালালের। দারুণ হাসির এই প্রেক্ষাপটটি রচনা করেও হীরালালের ফোকলা মুখে বসিয়ে দিলেন জীবন যন্ত্রণার কথা–'কেন মারধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ–এই করে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে...।' বৃদ্ধের পুত্র হারানোর যন্ত্রণার ভৈরব হার মানে এবং সেও এক কৌটো দাঁতের মাজন কিনে বসে। গল্পটি ট্র্যাজিক রসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

বনফুল মনে করেন 'কৌশল করে প্লট ভেবে ছক কষে প্রথম শ্রেণির গল্প লেখা যায় না।' কিন্তু বর্তমানে আলোচ্য 'ভিতর ও বাহির' ও 'আইন' গল্প দুটির ক্ষেত্রে উপসংহারের অভিঘাত থাকলেও ছক ও কৌশলের ভাবনাটি দুর্লক্ষ্য নয়। 'ভিতর ও বাহির' গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদে লেখকের বক্তব্য..... 'আমাদের মন সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাহিরের–অন্যভাগ ভিতরের। মনের যে দিকটা বাহিরের তাহা ভদ্র, তাহা সামাজিক এবং সভ্য। ভিতরের মনটা কিন্তু সবসময়ই সভ্য ও সামাজিক নয়–তাহার চালচলন চিন্তাধারণাই বিচিত্র। ভিতরের মন কখনও হাসে কখনও কাঁদে এবং রুচিৎ সায় দেয়। দুই ভাগের কলহও নিত্যনৈমিত্তিক।' তবে উকিল রামকিশোর বাবুর এইভিতরবাহিরের দ্বন্দ্বে বাইরের ব্যবহারিক মনেরই জয় হয়েছিল। কিন্তু বাইরের মনের অত্যাচার মেনে নিতে নিতে যেদিন রামলোচন উকিল বক্সিশ টাকা ফি নিয়ে প্রথম বিবাহে সন্তানহীন মক্কেলকে বলেছিলেন, 'ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি?' সেদিনই তিনি নিজের এবং কন্যার কপাল ভাঙলেন। এরপর 'আইন' গল্পটি শেষ করার আগেই পাঠক নিজেই শেষ করে নিতে পারে। কারণ, থিম এবং ফর্ম একি। এই গল্পের ডাক্তার টি সি পাল টাকা পেলেই অনেককে ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিয়ে দেন। অনেক দামি আসামীও ওই সার্টিফিকেটের বলে নির্দোষ হয়ে যায়। এমনই একজন দাগী আসামী জীবনচন্দ্র কুণ্ডুকে ডাক্তারবাবু এপেন্ডিসাইটিস অপারেশনের রোগী হিসাবে ব্যাকডেটে ভর্তি করেন এবং ডিসচার্জড সার্টিফিকেটও বেশ জোরালো লিখে দিলেন এবং তার আত্মতৃপ্ত হলো এরকম–

'এমন পাকা কাজ করে দিলুম যে, আইনের বাবারও সাধ্য নেই আপনাকে ধরে'। এসময়ই ডাক্তার পেলেন পুলিশের লম্বা খামের চিঠি এবং সেটা পড়ে তিনি বুঝলেন তার বড় ছেলের ঘাতককেই তিনি কিছুক্ষণ আগে মিথ্যা সার্টিফিকেটে গিয়ে নির্দোষ প্রতিপন্ন করেছেন। আইনকে মিথ্যার পোষণে ব্যবহার করতে করতে মিথ্যা কিভাবে একদিন ভয়ঙ্কর আইনি প্রতিশোধ নিল ডাক্তারবাবু তা ভালোই টের পেল। আসলে সংযমে বাঁধ দিতে না পারলে লোভী অসাধু ব্যক্তির ভয়ঙ্কর পরিণাম কোন্ স্তরে আঘাত হানে তাই বোধহয় গল্প দুটির মূল উপজীব্য। তবে এই ধর্ম বারবার ব্যবহৃত হয়ে পাঠকের কাছে একঘেয়ে হয়ে যায়।

ক্রমশ

এক 'এক দেশ-এক কর'-এর দেশে

অনিন্দ্য ভুক্ত
পর্ব-১

সংসার চালাতে গেলে যেমন খরচ করতে হয়, তেমনই উপার্জনও। সংসার ছোটো হোক বা বড়ো, আয় ও ব্যয় দুটিই আছে। আর সরকার চালানো মানেও এক অর্থে এক সংসারই চালানো। নিত্যদিনের শৈশেল ঠেলার খরচের দায় হয়তো এই সংসারে নেই, কিন্তু পরিবর্তে আছে বৃহত্তর সব খরচের দায়ভার। রাস্তাঘাট বানানোর খরচ, স্কুল-কলেজ চালানোর খরচ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত ক্ষয়ক্ষতি সামলানোর খরচ, এই রকম আরও কত কী। সরকারকে এই সব খরচ করতে আমরা নিত্যই দেখি। কিন্তু খরচ চালানোর জন্য অর্থ কোথা থেকে আসে? সরকারের আয়ের দুটি উৎস–কর রাজস্ব এবং অ-কর রাজস্ব। নিবন্ধের শিরোনাম থেকে পরিষ্কার আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুও হবে প্রথমটি।

তবে আলোচনা শুরু আগে আরেকটা কথা জেনে রাখা দরকার। আমাদের দেশের প্রশাসনিক কাঠামোটি অনেকটা যৌথ পরিবারের মতো, যে পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস পারিবারিক এক টুকরো জমি। আয় আসে একটি উৎস থেকে, ব্যয়ের মুখ কিন্তু অনেকগুলি। বাবা, মাকে নিয়ে তিন ভাইয়ের যৌথ সংসার হলে যা হয়, এক টুকরো জমি থেকেই সবাই চায় নিজের নিজের স্বাধীন ব্যয়ের টাকাটুকু বের করে নিতে। ফলে আয়ের বন্টনই এখানে বৃহত্তর সমস্যা। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই। জিএসটি চালু করতে যে এতগুলো বছর লেগে গেল তার কারণ হল এটিই। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থা ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটির আর্থিক কাঠামোটি কেমন হবে তা প্রথম ঠিক করে দিয়েছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। এই আইন প্রদেশগুলির আর্থিক স্বাধীনতা রক্ষার উপর জোর দিয়েছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে নতুন রাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামো গঠনে এই নীতিটিকেই মান্যতা দেওয়া হয়। তবে রাজ্যগুলির জন্য আর্থিক স্বাধীনতার নানা বন্দোবস্ত করলেও সংবিধান প্রণেতারা কেন্দ্রকে আর্থিকভাবে সবলতর করে গড়ে তুলকেই আগ্রহী ছিলেন।

আর্থিক স্বাধীনতার প্রথম কথাই হল উপার্জনের সক্ষমতা। যে কোনও সরকারের আয়ের দুটি উৎস–কর এবং অ-কর। কর উৎসথেকে আয়কে কর-রাজস্ব বলা হয়। তবে অ-কর উৎসের সবটাই কিন্তু রাজস্ব নয়, কিছুটা মূলধনী আদায়। রাজস্ব আদায় আর মূলধনী আদায়ের মধ্যে একটি প্রভেদ আছে। রাজস্ব আদায় কোনও দায় সৃষ্টি করে না, যা আদায় হয় সবটাই সরকারের পরিসম্পদের পরিমাণ বাড়ায়। কিন্তু মূলধনী আদায় সামগ্রিকভাবে সরকারের হাতে অর্থের জোগান বাড়ালেও দীর্ঘমেয়াদে তা দায় সৃষ্টি করে। মূলধনী আদায়ের উদাহরণ সরকারি ঋণ। সরকার যে সমস্ত কাজ করে তার জন্য প্রচুর অর্থ লাগে। কর রাজস্ব বা অ-কর রাজস্ব থেকে এই পরিমাণ অর্থ আদায় না হলে সরকার ঋণের আশ্রয় নেয়। কিন্তু ঋণ নিলে হাতে সাময়িকভাবে অর্থের জোগান বৃদ্ধি পায় বটে, দীর্ঘমেয়াদে ঋণ পরিশোধের একটি দায়ও তৈরি হয়ে যায়। সরকারি ঋণ তাই রাজস্ব আদায় নয়, মূলধনী আদায়। মূলধনী আদায় ছাড়াও অ-কর উৎস থেকে কিছু রাজস্ব আদায় হয়। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি সংস্থাগুলি থেকে সরকার যে লভ্যাংশ পায়, কোর্ট ফি বা অন্যান্য ফি বাবদ সরকারকে যে আয় হয়, সরকার যে ঋণ দেয় সেই ঋণ থেকে সুদ পায়, সেসব কোনও দায় তৈরি করে না। এগুলি তাই অ-কর রাজস্ব।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য আর্থিক স্বাধীনতার বন্দোবস্ত করার জন্য তাই প্রয়োজন ছিল এই সব কর ও অ-কর উৎসের কিছুকিছু তাদের হাতে তুলে দেওয়া। নতুবা, যদি কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয়েই, অর্থসংগ্রহের একই উৎস একসঙ্গে ব্যবহার করে তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিলতা তৈরি হতে পারে। এই কারণে কেন্দ্র এবং রাজ্য, কে কোন উৎস থেকে কর আদায় করতে পারবে তাও সংবিধানের ২৪৬নং ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যায়। ২৪৬নং ধারার অনুষঙ্গ হিসাবে সেটা সপ্তম তপশিলিতে আছে। সেই তপশিলে আছে তিনটি তালিকা–কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকাতে যে সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রই একমাত্র আইন প্রণয়নের অধিকারী সেগুলি আছে, রাজ্য তালিকাতে আছে যে সমস্ত বিষয়ে রাজ্য আইন প্রণয়নের অধিকারী; আর যে বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়নের অধিকারী সেগুলি আছে যুগ্ম তালিকায়। এখন কোনও কর আরোপ করতে হলে বা সেই করের হার ধার্য করতে হলে আইন প্রণয়ন করেই তা করতে হয়। সংবিধান যেহেতু একই বিষয়ে কর আরোপের অধিকার একই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যকে দিতে চায়নি সেহেতু যুগ্ম তালিকায় কোনও করের নাম নেই। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার ছাড়াও কিন্তু আমাদের দেশে তৃতীয় আরেক ধরণের সরকারের অস্তিত্ব আছে। এরা হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার, যেমন পঞ্চায়েত বা পুরসভা। এই সরকারগুলির হাতেও নির্দিষ্ট প্রশাসনিক দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য এদেরও অর্থের প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বা পুরসভাগুলিও যাতে কাজ চালাবার জন্য সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজেরাও কর বসিয়ে কিছুটা অর্থ সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য সংবিধান সংশোধন করা হয় ১৯৯৩ সালে। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী (কার্যকর হয় এপ্রিল, ২৪, ১৯৯৩ থেকে) বলে পঞ্চায়েতগুলির হাতে এবং ৭৪তম সংশোধনী বলে পুরসভাগুলির হাতে কিছু কিছু বিষয়ে কর আরোপ ও সংগ্রহের অধিকার তুলে দেওয়া হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্যকে আলাদা আলাদা বিষয়ে কর আরোপের অধিকার দেবার পর আরও একটি বিষয় অমীমাংসিত থেকে যায়–সংগৃহীত কর কীভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। প্রশ্নটি এই জন্যেই ওঠে যে, যে করগুলির উৎস রাজ্য-নিরপেক্ষ, সেই করগুলি আরোপের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হলেও তার একটি ভাগ রাজ্যগুলির পাওয়ার কথা। বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলা যাক। যে কেন্দ্রীয় তালিকার কথা বলা হল, সেই কেন্দ্রীয় তালিকার একটি বিষয় আয়কর (কৃষি আয়কর ব্যতীত)। এর অর্থ কী? কৃষি আয়কর বাদ কেন? বাদ, কারণ কৃষি কোনও রাজ্যের একান্ত নিজস্ব বিষয়। কিন্তু তাহলে কৃষি আয়কর ছাড়া অন্যান্য আয়করে কি রাজ্যগুলির কোনও অধিকার থাকে না? থাকা তো উচিৎ। অথচ, পশ্চিমবঙ্গের যে মানুষটি কর্মসূত্রে ওড়িশায় থাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তার আয়ের উপর কর বসানো সম্ভব নয়। এই কারণে আয়কর বসানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের হাতে, কিন্তু সংগৃহীত কর ভোগের অধিকার কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই। কর আরোপের পর তা কোন সরকার আদায় করবে আর তার বন্টন কীভাবে হবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা করা আছে সংবিধানের ২৬৮-২৭০ নং ধারাগুলিতে।

ক্রমশ

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

সম্পাদক সমীপেষু

কাটে না সময় যখন আর কিছুতে

সময় তার নিয়ম অনুসারে চলে যায়, তবুও কথা বলে যায়। আবার কথা গানে গানে বলে যায়। সেই কথাগুলো ভাবতে বসে মনে পড়ে যায় সেদিনের কথাগুলো। যখন কোনো না কোনো অনুষ্ঠান নিয়ে উপস্থাপনায় ভরিয়ে দিতাম আর সেই অনুষ্ঠান শোনার অপেক্ষায় বসে থাকতো হাজার হাজার শ্রোতা। তাঁদের থেকে পাওয়া প্রতিটি চিঠিই মনে হত এক মহা মূল্যবান উপহার। সেদিন কত চিঠি পেতাম। সেখানে প্রতিটি শ্রোতা তাঁদের ভালোবাসার কথাটা লিখে সেই চিঠি প্রেরণ করত। যা সেদিন অমূল্য রতন হিসাবে নিজের কাছে রেখেদিতাম। আবার পত্র পাঠকের নামগুলো বলে দিতাম। আজ অনেকটা সময় চলে গেছে। তবুও স্মৃতির সেই দিনগুলো বারবার মনে এসে যায়। আমরা সেই দিন বিবিধভারতীর অনুষ্ঠানগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে এসেছি। বেশি করে এই বিবিধভারতীর বেসি ভিত্তি অনুষ্ঠানও হত বিজ্ঞাপন দাতাদের। যারা তাঁদের অনুষ্ঠানগুলো সম্প্রচার করত তার জন্য যে মানুষটিকে দিয়ে উপস্থাপনা করাতেন, তাঁর নাম শ্রাবন্তী মজুমদার। অপূর্ব কণ্ঠ মহিমায় প্রতিটি অনুষ্ঠানের মান এমন জায়গায় এনে দিতেন, যে মনে হত তিনি একটা প্রাণের সঞ্চার করেগেলেন। মনে পড়ে যায় বরোলিনের দিনের সংসার এই অনুষ্ঠানটা যেন দিদির জন্যই সাজানো হয়েছিল। তিনি এমন একটা মনোরম অনুষ্ঠানকে কিভাবে উপস্থাপনায় ভরিয়ে দিতেন তা আজ আমার মনেরমণি কথায় ভেসে এলো। বিবিধভারতীতে আমরা পেয়েছি এমন বহু অনুষ্ঠান যা আজও মনটাকে ছুঁয়ে যায়। বেশি করে দিদির সেই কণ্ঠস্বরটাই মনে হয় আজও কানেতে বাজে। শুধু উপস্থাপনা কেন বলব দিদির গানের গলাটাও ছিল অপূর্ব। আমরা শুনেছি সেই সব গান। যা দিদি কখন একা গেয়েছিলেন আবার দ্বৈত কণ্ঠেও গেয়েছিলেন শতফুল বিকশিত হোক, আবার ছোট বেলার ময়না পাখি, মনে পড়ে যায় চাপা রঙের শাড়ি। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এর সাথে 'তুমি আমার মা, ভূপিন্দর সিং এর সাথে নাম বল না, অমিত কুমারের সাথে মনেরও আঁকাবাঁকা সে সবগান আজও শোনা যায়। তবুও কোথাও যেন দিদি বলতে চেয়েছিলেন কাটেনা সময় যখন আর কিছুতে তখনই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পাশ থেকে বলেছিলেন আয় খুকু আয়।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড (ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে), হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড (ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে), হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়